KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7·5" x 6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৬ কার্তিক ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৌষ ১৩২৬ ফাল্গুন ১৩২৬ চৈত্র ১৩২৬
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অদৃষ্ট ?

—:০:—

(Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে)

শাদা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো দুটি বন্ধুও সেখানে বসেছিল,—পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা দু'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে দিচ্ছিল ; একই কোণটুকুর ছায়া ও রৌদ্রে দু'টিতে গড়িমসি করত, একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো কথা কইত।

—"সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,"—বুড়ো দমনক এমন ভাবে এই কথাগুলি বল্লে, যেন সে ইতিপূর্ব্বে যা বলেছে, বা মনে করেছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বল্লে—"না, তা নয়। আর সকলের যেমন, অদৃষ্টেরও তেমনি ভুল হয়ে থাকে।"

প্রথম বক্তা মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছিল্য—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপর ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক আঁটি কাঠের মত চিম্‌সে ও খাঁজকাটা; এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে হাঁটু চাপ্‌ড়ে বল্লে—

—হাঁ হয়। আর এমনও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যার আবার প্রতিকার হয়।"

দমনক চাপা গলায় হুঁঃ বলে তার নিস্তেজ, লাল কোটরগত চোখ দুটি আকাশের দিকে তুল্লে। এই ভেবে তার মনটা নরম হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয়ত এমনি বাজে কথাই বল্‌বে।

কুলদা বল্‌তে লাগল—"আমি এককালে বীরনন্দিনীকে বিয়ে করেছিলুম। এখন আর আমি তার কথা মনেও করি নে। কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে দেখলুম, অনেকটা তার মত দেখ্‌তে; তাই তাকে আবার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বিয়ে করেছিলুম; আর তার দু'মাস আগে বন্দুকের এক গুলি মেরে তার বাপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।"

দমনকের হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তার সঙ্গী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বল্‌তে গেলে একলাই ঘরে রয়েছে। থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—

—"অ্যাঁ, কুলদা! তুমি ঘুমচ্ছ?"

—"না। আমি না ঘুমিয়ে ভাবছি। আমি যথার্থই সে মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োর দুই রগের মধ্য দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিয়েছিলুম। প্রথমেই ব'লে রাখি যে, সে মেয়েটি

বাপকে দেবতার মত পূজো করত, আর বাপও তাকে তেমনি ভালবাসত।"

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্প শোনে, দমনক তেমনি আবার শান্ত ও লক্ষ্মীটি হয়ে বল্লে—

—"সে অনেক দিনের কথা।"

—"হাঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অন্য কার কথা বল্‌ছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্ব্বে ঘটেছিল।"

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্ব্বজীবনের অনর্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বলে' যেতে লাগল—

—"বীরবাহু কর্ত্তা ছিল ধূর্ত্ত ও খাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার মেয়ে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্ম্মার ধাড়ি। আমার দ্বারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—এক তার মেয়েকে ভালবাসা ছাড়া;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা যেমন সেটা ভাল ক'রেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিত্বটুকু ছিল। আমাকে সে মেয়েটি যেরকম মুগ্ধ করেছিল, সেরকম অপর কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তার পরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত?"

—"হাঁ" বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।

—"তাই বল্‌ছিলুম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের সব লোকে তার মত বদ্‌লাবার অনেক চেষ্টা করলে; কিন্তু সে এমন ভাব দেখাত, যেন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতে পারছে না। বেশি দূর এগোতে কেউ সাহস করত না। কারণ, বীরবাহুর শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাহু ছিল কুস্তিগীর

পালোয়ানের মত, আর হাত দুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস করে তার সাম্‌নাসাম্‌নি কথাটা পেড়েছিলুম,—অতি নীচু গলায়,—কিন্তু সে আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে। ততক্ষণ নন্দিনীসুন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে দুই মুঠো দিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফোঁস-ফোঁস করছিল। আমি অক্ষমতায় ও লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবলুম—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সয়তানের মত পাপিষ্ঠ ও ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ! আর যত কিছু চেষ্টা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও বেশি অপদস্থ করা। তার চেয়ে জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই ঢের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল। আমার বন্দুকে এক গুলি ভরলুম,—আর প্রেমিক মানুষের মনের মত একটি সুন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম। কাজ হাঁসিল করবার উদ্দেশ্যে বুড়ি-ক্ষেতের মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক করে ধরেছি, এমন সময় প্রথমে শুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি গাড়ী সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল—বীরবাহু কর্ত্তার গাড়ি!—আমারও ভাল কথা মনে পড়ে গেল যে, মাসের এই দিনেই সন্ধ্যেবেলা সে তাম্‌লি গিন্নীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা কদম কদম চল্‌ছিল। গাড়ীটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে; সেই লম্বা প্রকাণ্ড শরীর—যা আমার চক্ষুঃশূল—সেই পাখীর ঠোঁটের মত নাক, সেই মস্ত ছুঁচোলো দাড়ি, সেই কালো বর্ব্বর মূর্ত্তি, যেন

কাফ্রিদের রাজা। তখন যে পশু আমাকে এমন ভাবে কোণঠেসা করে' দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত করেছে, তাকে একেবারে হাতের কাছে বাগে পেয়ে আমার মাথায় এরকম খুন চ'ড়ে গেল যে, সে বলবার নয়। আমি এক লম্ফে উঠে পড়ে' বন্দুকটা ঠিক তার রগে তাক করলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দটি না করে' সে যেন ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার লেজের দিকে একটা বোঝার মত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ল। ঘোড়াটা ভড়্‌কে গিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়ের কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে লাভচাঁদদের জোতজমার মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। আমি পালালুম—লম্বা লম্বা পা ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালুম,—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, আমাতে আর আমি নেই! পাগলের মত বেগে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে পড়বার পর তবে আমার হুঁস হতে লাগল যে কি করেছি। তখন যেন খোঁচা খেয়ে আরও মরিয়া হয়ে মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি সেকালের সব কথাই প্রায় ভুলে গেছি, কিন্তু আজও মনে আছে,—যেন সেদিনকার কথা—কোন্ কোন ভয়ঙ্কর ঝোপ সেদিন রাত্রিতে ডিঙ্গিয়ে গেছি, কোন্ কোন্ মারাত্মক বাধা উল্টে ফেলে দিয়ে পথ করে' নিয়েছি। মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা'তে যৎকিঞ্চিৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তের মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে তাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্র ছেড়ে গেছে, কিন্তু যেখানে আর একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেতনা হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে তাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা না করে থাকতে পারলুম না। একবার তাকে দেখব—

জানলার ভিতর দিয়ে—কেমন অপেক্ষা করে' বসে আছে, আগুনের লাল আভায় অন্ধকারে আধ-ফুটন্ত! দেওয়ালের বরাবর যত আস্তে পারি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গেলুম; ফিরলুম।—আঃ! ঐ যে, জানলা খোলা আছে, তার ধারে সে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে। সে বসে আছে যেন স্বর্গের দেবীর মত শাদা, আর আমার মনে হল তার ভিতর থেকে কি একটা আলো ফুটে বেরচ্ছে। সত্যি, সে হাসছিল! সে দেখতে পেলে আমি ক'হাত দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আরও জ্বলে উঠল, হাসি যেন আরও ফুটে উঠল! সে বল্লে—"ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। বাবা রাজি হয়েছেন। তিনি দেখলেন আমি কি-রকম কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমার দুঃখ দূর করবার জন্যে হঠাৎ হাঁ বল্লেন। এইমাত্র বেরিয়ে যাবার আগে তিনি হাঁ বল্লেন ও হাসলেন।"

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত বের করতে পারলুম না। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, চোখ কানা করে দিয়েছিল। জানিনে কেমন করে পিছু হট্‌লুম, কেমন করে দেওয়াল টপ্‌কে তার দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন ক'রে পালালুম। কেবল মনে আছে সেই মুহূর্ত্ত, যে সময় নিজের বাড়ী পৌঁছলুম,—এক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে, আর এক হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরে'—পৃথিবীতে এখন ঐ হ'ল আমার একমাত্র সম্পত্তি! রান্নাঘরে ঢুকে, কোন আলো না জ্বালিয়েই, চোখ না খুলেই, আমার সাধের টোটা খুঁজ্‌লুম, পেলুম, ও বন্দুকে পূরলুম। কিন্তু অদৃষ্টের এই ভীষণ সর্ব্বনেশে অত্যাচার আমাকে এতদূর পিষে ফেলেছিল—আহা এমনি মারই মারলে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে সে খবরটা জানবারও অবসর

দিলে না,—যে আমার আত্মহত্যা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নিতে গিয়েছিল। সেই জন্যই কি গুলিটা ফস্‌কে গেল?—সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুধু গুলির তপ্ত শ্বাসের আঁচটুকু আমার মুখে লাগল, আর সে শুধু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টল্‌তে টল্‌তে মাটীতে পড়ে গেলুম,—ভাবলুম মারা গেছি।

পরদিন বেলা দুফুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙ্গল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, কিন্তু বাইরে একটা মহা সোরগোল হচ্ছিল; লোকজন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ থৈ থৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন জঙ্গ দরজায় এক ধাক্কা মারলে। আমার চেয়ে তখন সে বছর কতকের বড় ছিল, পরে বুড়োরোগে মারা গেছে। আর এক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোক্‌লা মুখ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

—বীরবাহু কর্ত্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।

—অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলতে বলতে আমি পাঙাস মেরে ঘরের শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলুম।

—সেই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা গ্রাম থেকে বেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে দু'পা বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি খেয়েছে, সে একেবারে মরে' কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একগঙ্গা রক্ত পড়েছিল। তারপর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আস্তে আস্তে যেতে দিলে।

অনেকক্ষণ পরে, বুড়ী-ক্ষেতের মোড়ে, ঘোড়াটা কংসপতির বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিল।”

আমি তা'হলে তাকে মেরে ফেলি নি। কারণ সে আগেই মরে গিয়েছিল! মরাকে কেউ খুন করে না।—এখন দেখ্‌ছ,—এ স্থলে অদৃষ্টের হাত ছিল বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অদৃষ্ট।

—:*:—

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা থেকে “অদৃষ্ট” নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এ দেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সত্য, তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

(১)

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা উঁচু-করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখ ও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে ভুল হয়। সেই সার সার দোতালা সমান উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড়

নয়, ছোট ; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলিঘুঁচিতে আরো দশ বিশটা মেলে, তবে খেলারামের বসতবাটীর সুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—তার সিংহদরজার দু'ধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেতী-শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইঁটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চূণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সন্ধ্যে, পয়সায় পাঁচটি করে খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

(২)

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলিকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলিকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতী-দস্তুর সাজিয়ে ছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার! তারপর সাটিনে ও মখমলে

মোড়া কত যে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিষ ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তি-সকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত--তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সদ্য নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন,—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরা সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে" —একথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মো-সাহেব বলে ওঠেন, "তাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত—শাড়ীর দাম দিতে"। এ উত্তরে চারদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হল যে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলিকাতা সহরেও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

(৩)

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়েসের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষা-প্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিঁচুড়ি পাকালে, ও দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী-বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত একজন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক সমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্টার নন, তা'হলেও তিনি ইংরেজী পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফর্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু

আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে-রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌঁচুলি হলে তিনি যে Bar-এ ফেল করে bench-এ যে প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন?—ছেরেপ মুরব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড় মানুষের জামাই—অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

(৪)

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন,

সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরম হিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষা লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত—আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন,—"দেখ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে ;—আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো ?—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে ; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্‌বাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ-কড়া করে ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হলেই তারা পির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায়

তোমাকে একটু রাশ-ভারি হতে হবে আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন যোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে-সাহেব আশ্বস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী—দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌর-কার্য্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশ-ভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চ্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশ-ভারি হতে না পেরে গম্ভীর হতে পারলেই জমিদারী-শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তারপর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়ে মানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আফিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায়

আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

(৫)

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়েবারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তারপর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক—সেখানে কর্ম্মচারীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হলেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন লাগে?

মুস্কিল হ'ল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরোণো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে বিশ বৎসরকাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে—বরাবর কাজ করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়েনি, তার কারণ, সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিস, এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার

প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রকম চমৎকার, তার মাখা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্ব প্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তমে" এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কেয় প্রথমে বেশ করে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে, তার উপর আল্‌গোছে মাটীর তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে স্তরে স্তরে টিকে সাজিয়ে, তার পর সে টিকার মুখাগ্নি করে, হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে' ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধ ঘণ্টা তদ্বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে' নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের

কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে, সে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তার করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসান ও অস্থুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে যে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে। অথচ তাঁর বেতন বৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেন না, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্ত্তৃপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করত, যা খুসি তাই বলত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্ত্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কান দিতেন না; কেন না, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেনসানভোগী।

(৫)

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয় সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম্ম হতে অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুয্যে-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে—হুজুর! সাড়ে আট্‌টার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে, এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌঁছান যায়" ?

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আট্‌টায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌঁছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

দুদিন না যেতেই, চাটুয্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণ-

বন্ধুকে ডেকে কখনও তন্মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে এক দিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর স্বরে বললে—"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠতে হত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে ডান হাতে কলম চালাতুম"।

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল; কেন না, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একখানি জরুরি দলিল যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না ক'রে নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হুজুরের উপর দু-দু-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর

আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি"।

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন"?

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরীব মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম"।

এর উত্তরে চাটুয্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা যে ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আর যার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না। তিনি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন—"দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেলল—"বড় মানুষের জামাই! কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়"।

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাকরোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জ্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল, আর এক ছিলিম ভাল করে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু

নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

(৭)

চাটুয্যে-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বহাল করা হোক। নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিনকালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার এতদিন বজায় ছিল আজ তা যাবার এমন কোনো নূতন কারণ ঘটে নি। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরুতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবিষ্যতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, তারপর সপ্তম দিনের সকাল বেলা চাটুয্যে-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তারপর তিনি যখন খড়া-চূড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একখানি

মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেক নজরে দেখেন না, কেন না আমি চোর নই অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ অমন বুদ্ধি অমন বিদ্যে অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি। প্রিয়পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে ষ্টেট্‌টা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা-পাঁচটা ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান?—ঠিক একটি সাক্ষী-গোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানি নে। কেন না, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে, 'হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেন না এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তা'হলে পোষাক পরলেও সাহেব

হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান?—মেম-সাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো?—এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রংটা ফ্যাকাসে—সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি গোফের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেম-সাহেবের মেম-সাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মত গুণী-লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কিনা অনেক দিন আছি বলে জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেন না তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কাণা। তাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেম-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়, এঁর স্ত্রী শুনছি ভারি সুন্দরী, প্রায় তোমার মত। তারপর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না, মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক এর গৃহিনীকে যে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বার মত জিনিষ। আমার দুঃখ রইল এই যে সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই কর্ত্তাঠাকুরাণী খুব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী এ দুজনের মধ্যে

কে বেশি গুণী। আশা করছি কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুয্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্টহাসি হেসে স্ত্রীকে বল্লেন—"এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোড়া হয়েছে।'

বলাবাহুল্য পত্রপাঠ, প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারেন এবং স্ত্রীর কাছে অপদস্ত হওয়া ছাড়া। কেন না তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেন না তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবযুগের কথা।*

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যখন বেশি দিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার যো নেই, যে পথে হোক তাকে যখন চলতেই হয়, তখন যে-সভ্যতা কিছুদিন টিঁকে থাকে, তারই যুগের পর যুগ আসে। অর্থাৎ—এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের খানিকটাকে দু'একটা সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট লক্ষণ অনুসারে পূর্ব্বাপর থেকে সেটিকে তফাৎ করে তার একটা যুগ নাম দিয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের কারবার চালান। এবং এ হিসাবে পরবর্ত্তী যুগ মাত্রেই পূর্ব্বের যুগের তুলনায় নূতন যুগ। কিন্তু 'নবযুগ' কোন নূতন যুগ নয়, সে হ'ল নবীন যুগ। গাছের জীবনের বার্ষিক ইতিহাসে শীতে যখন পাতা ঝরে' ন্যাড়া ডাল ক'খানি টিঁকে থাকে সেও একটা নূতন যুগ; কিন্তু যখন বসন্তের স্পর্শে তার সারা দেহ রঙ্গিন কিশলয়ে সাড়া দেয় সেইটি হ'ল তার নবযুগ।

কোনও সভ্যতারই এমন সৌভাগ্য ঘটে না যে আগাগোড়া তার জীবনটা হয়, একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। কখনও দৌড়িয়ে, কখনও খুঁড়িয়ে এমনি করেই মানুষের সভ্যতা চলে। কখনও তার জীবনে আসে প্রাণের জোয়ার, যা তাকে অপূর্ব্ব লীলা ও অভিনব সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়। কখনও বা তার প্রাণের স্পন্দন মৃদু হয়ে

* চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

আসে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে; সে তখন প্রাণপণে প্রাচীন সৃষ্টিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নূতন পথে পা দিলেই যা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায়। সভ্যতার এই যে সম্প্রসারণের যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লীলার যুগ, এর প্রারম্ভই হ'ল 'নবযুগ'; যে-যুগ নবীন সৃষ্টির বেদনার পুলকে আকুল, যার অরুণালোক রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সূর্য্যোদয় ঘোষণা করছে। যে প্রবন্ধ-পুস্তক খানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালী জাতির সভ্যতায় আজ এই রকম একটি নবযুগ এসেছে।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুঁথিখানি তার একটা প্রমাণ। বইখানিতে লেখকের নাম নেই। প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে 'প্রবর্ত্তকে' বাহির হইয়াছিল"—এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই বলা আবশ্যক মনে করেন নি। সুতরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব।

বইখানিতে 'মুখপত্র' ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলি একই সুরে বাঁধা, এবং তাদের অন্তরের কথা মোটামুটি একই। লেখকের মর্ম্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা [illegible] মধ্য দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধগুলি [illegible] ই অন্তরের বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুঁথিখানিতে লেখক যা বলেছেন তার দু'টো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক—অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক—অর্থাৎ সাহিত্যাংশ। প্রথমটা তর্কের বিষয়, সুতরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই। দ্বিতীয়টি নিয়ে কোনও তর্ক উঠবে না। সেটি নবীন বাঙলার একেবারে অন্তরে গিয়ে

পৌঁছিবে। কেননা বিংশ শতাব্দীর বাঙলার মর্ম্মকথাটি এ প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের সুষমাময় মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বিচারের কথাই আগে বিচার করা যাক। বিচারের বিষয় হ'ল আমাদের অর্থাৎ—হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ। এ প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রায় সব ক'টি প্রবন্ধেই আকারে ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'মানুষের কথা' প্রবন্ধটিতে লেখক সোজাসুজি একটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। "আমরা ত চিরকাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরাও ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন্ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আজ আমাদের এ অবস্থা?"—এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, "ইহার একই উত্তর, সে উত্তর হইতেছে এই যে, আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অস্বীকার করিয়াছি—তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি।" উত্তরের ব্যাখ্যায় লেখক বুঝিয়েছেন যে মানুষ তার দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; তার বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়; তার কর্ম্ম, ভোগ, ত্যাগ এই সব নিয়েই তবে মানুষ। যদি এর মধ্যে কতকগুলিকে অস্বীকার করে, অমঙ্গল ভেবে পিষে ফেলবার চেষ্টা করা যায় তা হ'লে মনুষ্যত্বকেই পঙ্গু করা হয়। ফলে জাতির মন থেকে জীবনের যে সহজ আনন্দ, সে আনন্দ থেকে মানুষের সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বৃহতের সৃষ্টি, সেটি চলে যায়।

তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে দুর্ব্বহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম্ম হয় প্রাণহীন আচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আঁকড়ে থাকা, ত্যাগ হয় অপৌরুষের অক্ষমতা। লেখক বলেন, "হিন্দুজাতিটা কয়েক শতাব্দী ধরে' এই অস্বীকারের, এই পিষে-ফেলার কাজটা করে আসছে। আর তার অধঃপতনও হয়েছে তখন থেকেই, আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকেরা সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন দুঃখময়, জগৎ মায়া, ভোগ অমঙ্গল। আর এই দুঃখ থেকে, মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মুক্তির এক উপায় কর্ম্ম-ত্যাগ, ভোগে বিরক্তি, জগৎকে অস্বীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হ'ল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা' বাড়াতে হলেই চাই "ইহামুত্রফলভোগ বিরাগং," কি একালে কি পরকালে ফল ভোগে বিতৃষ্ণা। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্বাদ, প্রাণ হ'ল আনন্দহীন, কর্ম্ম হয়ে উঠল বেগার। দেহের রক্তপ্রবাহ মৃদু হয়ে গেল, তার হাত-পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাতিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেন না "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সে হয়ে উঠল আমরা বর্ত্তমানে যা, অর্থাৎ—'জড়ভরত'। তার কর্ম্মও থাকল, ভোগও গেল না; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা 'কর্ম্মভোগ'। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "জীবনে উচ্ছ্বাস শক্তির অনুভব করিতেছি—মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা

খেলিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্য্যরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে না পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিতে না পারে—এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহরণ করিতে না পার।"

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠবে তা এই যে, সত্যিই কি হিন্দু জাতিটা তার দুঃখবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্য্যদের উপদেশ মনে আঁকড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, সৃষ্টির ক্ষমতাকে পঙ্গু করে' ক্রমে 'জড়ভরত' হয়ে উঠেছে? এই দুঃখবাদ আর মায়াবাদ, এ কি জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার ফল? রোগের নিদান না রোগের লক্ষণ? হয়ত এ মতবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন সরস ও সচল ছিল, কেন না দার্শনিক চিন্তাও একটা সৃষ্টি, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতির জীবনের উপর লেখক এদের যেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব? জাতি যখন 'জীবনে উচ্ছ্বাসশক্তির অনুভব' করছে, যখন তার মনে 'কল্পনার অনন্ত খেলা খেলছে,' 'বুদ্ধিতে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি' ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয়; না, কান দিলেও মন দেয়? সৃষ্টিপদ্মের আনন্দমধু যার জিহ্বাতে লেগে রয়েছে তার কানে 'জগৎ মিথ্যা' মন্ত্র জপে দিলেই কি সে মধু তিতিয়ে উঠবে? বরং এই কি সত্য হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাতির জীবনে

যখন ভাটা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তখনি সে ঐ মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন্দ, বেশি করে কর্ম্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছে? জাতির জীবনে এই যে ওঠা নামা, উৎসাহ অবসাদের যুগ একটার পর আর একটা আসে, লেখক তা মোটেই ভোলেন নি। তাঁর 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার করেই বলেছেন। কেন যে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা জাগরণ, বিকাশ সংকোচ, একের পর আর আসে তার রহস্য কে জানে? এ ত জীবন মৃত্যুরই রহস্য! এবং সে পুরাণ রহস্য চিরদিনই গুহাস্থিত, এবং হয়ত চিরদিনই তেমনি থাকবে। অবশ্য প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান পতনের একটা ইতিহাস আছে। হিন্দুর সভ্যতারও তা আছে। এবং সে ইতিহাস নিশ্চয়ই জটিল; এক কথায়, একটা সূত্রে গেঁথে ফেলার বিষয় নয়। কারণ মানুষের সভ্যতা জিনিষটিই অতি জটিল, এবং হিন্দু-সভ্যতা আর সব সভ্যতার চেয়ে কম জটিল ছিল মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে তোলা চলে না। কেননা তার পনর আনাই এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এবং হয়ত তাকে ঠিক সত্যকরে বিচার করবার মত এখন আমাদের মনের অবস্থাও নয়। বর্ত্তমানের দারিদ্র্য না ঘুচলে পূর্ব্বপুরুষের কি ঐশ্বর্য্য কি দারিদ্র্য, কিছুই মন খুলে বিচার করা সহজ নয়।

কিন্তু এ সব বিচার বিতর্কের কথা এখানেই শেষ করা যাক্। এই সব যুক্তি-বিচার এ প্রবন্ধগুলির প্রধান কথা নয়। লেখকও তাদের প্রধান করতে চান নি, লেখাতেও তারা প্রধান হয়ে ওঠে নি। এ প্রবন্ধ-পুঁথিখানির প্রধান কথা ও প্রাণের কথা হ'ল বাঙালীর

জীবনে আজ দীর্ঘরাত্রিশেষে জাগরণের যুগ ফিরে এসেছে। সেই সহজ আনন্দ ভগবান আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন যার প্রাচুর্য্য হল সভ্যতার সমস্ত সৃষ্টিধারার মূল উৎস। লেখকের প্রাণে এই আনন্দের যে সুর বেজে উঠেছে প্রবন্ধগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তারই ঝঙ্কারে মুখর। এবং আগেই বলেছি, এ সুরের ঢেউ নবীন বাঙলার একেবারে মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করবে। হিন্দু-সভ্যতার কেন পতন হ'ল, এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু লেখক যখন ডেকে বলেছেন—"আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে; অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে রাখতে সক্ষম হয় নি—তাদের আজ লড়াই করতে হবে এই ত্যাগ মন্ত্রের বিরুদ্ধে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্ত্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ঢলে পড়ছে তারা করবে না—ঊষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাঁধকের বেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা করবে, আমি আহ্বান করছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নি'ক।" তখন তার আহ্বানে, আজ বাঙলায় যারা নবীন তারা সাড়া দেবেই দেবে। কেননা আনন্দের এ সুর তাদের প্রাণে এসেও পৌঁচেছে। এ লোনার কাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে সেই মনে জানে—যে-ত্যাগের মন্ত্র বিশ্ব থেকে মানুষকে বিমুখ করে সে যারই ধর্ম্ম হোক আজ বাঙালীর পক্ষে সেটা পরধর্ম্ম। শীতের দীর্ঘ রাত্রির পক্ষে 'অচলায়তনের' পাথরের ঘের ও আচারের কম্বল-চাপ কতটা উপযোগী কি অনুপযোগী, এ নিয়ে বিচার চলে। কিন্তু আজ

বসন্তের ঊষায় রঙ্গীন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াতেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন দুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' তাঁরই চোখে পড়বে। এর একটি হ'ল "দরকার," আর একটি হ'ল "ইয়োরোপের কথা।" দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, "আসল, সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তাই।" ও কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যায়।—সাহিত্য মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তারই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে আর যে করে না, এ দু'য়ের অন্তর এক রকম নয়, এবং তাদের সৃষ্ট-সাহিত্যও এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অন্তরের ভিতর দিয়ে না এলে জিনিষটি মোটে সাহিত্যই হয় না। এ দুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা দেশে তা সুলভ নয়; কিন্তু সে চিন্তা এসেছে লেখকের অন্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আর প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যের সুন্দর মূর্ত্তিতে। "দরকার" প্রবন্ধটির কথা এই:—"দর-কারের তাগিদে মানুষ সভ্যতা গড়ে নাই, কেননা বেশির ভাগ দরকার সভ্যতারই ফল। এই সৃষ্টিটা অদরকারা বলেই, এ পৃথিবীর হাজার বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানে দরকার সেখানেই দাসত্ব।" "Necessity is the mother of invention—এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা—necessity, invention-এর mother ত নয়ই, মাসী পিসীরও কেউ নয়—ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃত জনের কথা, ধরতাই বুলিরই একটা বুলি। Invention-ই বল, discovery-ই বল, আর যাই বল,

এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ করবার আনন্দ—সৃষ্টি করবার আনন্দ।" 'ইয়োরোপের কথায়' লেখক এই রকম আর একটি 'ধরতাই' বুলির' টুঁটি চেপে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে—আধুনিক ইয়োরোপ জড়সর্ব্বস্ব আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক "ইয়োরোপ তার অন্তরের, তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে যে সভ্যতা গড়ে' তুল্‌ল—যে সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল—যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নূতন প্রাণ জেগে উঠল—সে সভ্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে—তাতে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে—হয়ত তাতে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান হ'য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে' যে সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে' আছে কতগুলো জড়বস্তুসমষ্টির উপরে এ কথা যে বলে তার মত জড়বাদী এ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। জড়বস্তুর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।" "বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইউরোপকে গড়ে' তোলে নি—ইউরোপই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে—আপনার অন্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয্যে—প্রাণের গতির বেগে। আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই, যতক্ষণ না সেটা মানুষের অন্তরের শক্তিতে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং ইউরোপ আজ যা, তার মূল কারণ হচ্ছে তার জীবনে অনুভূত—প্রাণে ওজস্-রূপিনী চিৎশক্তি—তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস।" তারপর প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে' দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাটি বের করি তার মাপে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের যুগগুলিকে

জড়সর্ব্বস্ব বলে' ঠেলে দিতে হয়।" যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে যুগে কি তারা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্কল পরে' সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন—না সীতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হ'ল, সে ত একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করবার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে' উঠত না।" লেখক এই কথা বলে' তাঁর "ইউরোপের কথা" শেষ করেছেন,—"আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান অধিকার করে' বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে' থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ক কদলীর চাষ করবে, তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়।"

এ প্রবন্ধ দুটির অন্তর্দৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও তেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গীও তেমনি সরস ও বিচিত্র।

তাঁর ন'টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুর্গেনিক তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "জাতিকে গাল দেবার কেবল তারই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাসে। "নবযুগের কথা" পড়ে' কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে অধিকার নেই।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বাদল ধারা।

—:*:—

আষাঢ়।

ভোর বরষার জলে ভাসা আজ এ আমার পল্লীপারে
বাজ্‌ল উতল একি রে সুর বাজ্‌ল আলোর বিভোর তারে,
বাজ্‌ল মোর এ বিভল হাওয়ায়, বাজ্‌ল জলের কলস্বরে,
বাজ্‌ল সবুজ রেখায় রেখায়, বাজ্‌ল মেঘের থরে থরে,
বাজ্‌ল সারা গগনেরি অযুত সাঁঝের কাজল পরা
আঁখিকোণের অবাক্ ধারায় কোন্ নিবেদন—বাঁধন হরা!

পাল্ক টেনে ঐ বাতাসে কি ছুট্‌ল রে আজ ছুট্‌ল তরী
পরিয়ে দিয়ে গানের মালা ভোর সাগরের লহর ভরি,
সুরের শাড়ী উড়িয়ে ধূ ধূ নূতন জলের তেপান্তরে
সবুজ বাঁশী বাজিয়ে নিখিল ছুট্‌ল রে আজ পাগল করে!
বন ভেঙে দূর ছায়াবীথির লহর-নাচা নিরুদ্দেশে
গেয়ে গেয়ে ধর্‌লে পাড়ি অশ্রুপাগল আলোর দেশে!

ফুলে' ফুলে' মেঘের কোলে কেঁপে কেঁপে ধানের ক্ষেতে
অথা' জলের পাপ্‌ড়িফোটা মেতে নাচের ফুলবনেতে

দোল্ খেয়ে ঐ পাতায় পাতায় ছুট্‌ল রে আজ ছুট্‌ল তরী
দুধারে তার ভাঙা ঢেউয়ে নূপুরে সুর পড়্‌ছে ঝরি,
পড়্‌ছে ঝরে' পাখীর মুখে—সিঁদুর-আঁকা যাত্রাপথে
বুকে বুকে ভোরেরি থৈ ভুবন ভরে ছিটা'ল কে!
কূলে কূলে বাজ্‌ল কাঁকণ—আধেক গাওয়া মনের কথা—
বাদল রাতের পুঞ্জকরা ব্যাকুল কূলের আকুলতা
বাজ্‌ল ছায়ার কমলমনে ভেজা-আলোর চরণতলে
বাতাসেরি কানের পাশে বাজ্‌ল জলের ছলক্ ছলে,
গুঞ্জরিল আকাশে গান আলোধারার মধ্যখানে
তরী আমার ছুট্‌ল ভরে অফুরণ ঐ গানে গানে!

উড়িয়ে দিল পথের বাঁকে নিশানখানি বকের পাখা
কবুতরের মনমাতান মোহনপুরের রৌদ্রমাখা,
ষোড়ঘুড়ুরে বৈঠা আমার হাঁসের ঝাঁকে পড়্‌ল মরি!
যত প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে সকল গানের সুর শিহরি!
মেঘে মেঘে বনকাননে ডঙ্কা আমার বাজায় রে কে—
পালাল যে আকাশ ছেয়ে 'বৌ কথা কও' লিখে রেখে!
বাজাল ঐ ডাহুক দূরে ছোট্ট তাহার ডুগডুগিটি
ওই পারে তার যে আছে আজ এই যে রে তার আসুল চিঠি!

কি সে জানে কখন্ হল পড়া লিখন ভর-সভাতে
চখাচখীর চোক বুলিয়ে সকল মাঠের যতেক হাতে!
ঠেক্‌ল কখন হঠাৎ পায়ে ছেলের দলের, গণ্ডগোলে,
রট্‌ল যে তা যত মাতাল দাদুরিদের মত্ত রোলে!

থম্‌কে-থাকা নূতন বৌয়ের ঘাটের পথ আজ এমন দিনে
একি বাতাস উথাল-পাথাল বাজায় এসে বুকের বীণে ?
চোকের তারার সব সীমানায় বিছান আজ আঙনখানি
কর্‌ল যে আজ কর্‌ল তারে কর্‌ল রে আজ মনের রাণী !

আকাশপারে ঢেলে কালি খল্‌খলিয়ে হাস্‌ছে মুখে
আখরগুলি শেষ করে সব গালে গায়ে মেখে চুকে,'
দুষ্ট ছেলে কচি দাঁতে ফুটিয়ে চেয়ে হাসির রেখা
মুক্তামালার মত করে ছড়িয়ে দিল সকল লেখা !

শ্রাবণ।

দু'ধার থেকে তা নিয়ে যে শরবনে কি মাতামাতি
পাকাধানের ক্ষেতে ক্ষেতে লাগ্‌ল বিষম হাতাহাতি,
অগাধ হল ফিস্‌ফিসানি খস্‌খসানি বাঁশবনে আজ
ঘোমটা টেনে কলার বনে কিসের কথা ? ঐ অত কাজ ?
হাসির বাঁশী, নিশাসরাশি, জম্‌ল কি গো নয়ন পুটে
কুঁড়ের পথে আঁচলপাতা কার হল—কার পড়্‌ল লুটে ?
হারাদিনের অদূরকথা, বুকের কারো আশার ভরা,
তাই দিয়ে আজ খুল্‌লে কি গো প্রথম দিনের অঝোর ঝরা ?
ভাস্‌ল যে আজ সেই ধারাতে তালপাকান রুক্ষজটা
সকল-সহা মুক্তমাঠের যাদুর পাহাড় মানুষ কটা ;
কম্‌ল না দুরন্তপনা কম্‌ল কোথা কচুর বনে ?
কান্না হাসি সব ঠেলে যে নাচ্‌ছে ওরা ক্ষণে ক্ষণে ;

কোমর কেচে ধঞ্চেরা সব স্রোতের মুখে জুট্‌ল এসে
শিঙারি সুর লাগ্‌ল কানে কেয়াফুলের গন্ধে ভেসে,—
বুঝ্‌বে কি গো আর ওরা আজ ? আর কি ওরা থাক্‌তে পারে ?
দাঁড়াল সব জয়পতাকা চরণ ঘিরে সারে সারে !
মাছরাঙারি পাখায় পাখায় ফড়িংগুলির পায়ে পায়ে
সব কথা যে রঙিন্ হয়ে ছড়িয়ে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে !
ছড়িয়ে গেল সকল রাতের রক্তরেখার উপর দিয়ে
হাজার দিনের হাসির পায়ের ধূলোরিদাগ ধুয়ে নিয়ে
ঢেউয়ের নাচে নাচাপরাণ চপলস্রোতের সাথে সাথে
চোকের আগের পথেরি ঐ কোলাকুলির আঙিনাতে !
বুকচেরা পথ মাঠের বুকে সিঁথির মত রইল আঁকা
বাউল ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গানের ভুবন মেল্‌ল পাখা !
মেল্‌ল পাখা হাজার তরী চল্‌ল যে সব পাখীর মত !
সবুজ মেঘের কিনার দিয়ে বাঁশীর সুরে তন্দ্রাহত,
রেখে রেখে গেল নিশাস্ উধাও জলের বুকের ঢেউয়ে
খুল্‌বে ঢাকন্ কখন্ কি তার জান্‌বে কি তা জান্‌বে কেউ এ ?
বুকের মাণিক চল্‌ল যে আজ রৌদ্রঢালা অভিসারে
নয়তো সে কোন্ দূর অজানা ধারানিবিড় অন্ধকারে,
হয়তো আকুল ধরণীর এই আপনহারা পারাবারে
নয় তো আতুর মিথ্যা প্রাণের হাজার ঘাটের পারাপারে ;
নয় তো আপন বুকের ঠাকুর বুকে ঢেকে কর্ম্ম করা,
নয় তো হাওয়ার হাসির ভেলা, নয় আগুণের তূষ-পশরা !
—বাজিয়ে নিয়ে সকল বেদন জলধারার খঞ্জনীতে
ভাটিয়ালের প্রভাত সুরের পরাণভরা গহনগীতে !

ভাদ্র।

কথা শুধু জান্‌ত দুজন—পানকৌড়ি আর কল্‌মিলতা
ভিজে ভিজেও মিল্‌ল না তো আজো তাদের মনের কথা!
বিষম কালো উড়্‌ল যে কেউ নীল হয়ে কেউ ফুলায় যে গাল,
ঝিনুকগুলির বুকেই শুধু রইল গোপন একটুকু লাল
শাপ্‌লা মেয়ে চুপি চুপি বল্‌তে এসেই হল্‌দে হয়ে
এলিয়ে পড়ে ঝাউমাসীদের ডরে ভয়ে একটু কয়ে;
পাড়ায় পাড়ায় হল না গো ইশারার আর একটুও দেরী
জলে স্থলে একেবারে অম্‌নি তাহার বাজ্‌ল ভেরি!
গগনরাণী হাওয়ার গায়ে ফুলের ডালা দিল ঢেলে
শুপারীগাছ নেয়ে উঠে হেসে হেসে পড়্‌ল হেলে,
খোঁপায় কাঁটা কদমবধূ শুন্‌তে এসেই কথাটি সে—
আঁচলে টান পড়্‌ল যেমন—মুদল আঁখি শিউরে উঠে!
—গভীর সুরে রেশটি তাহার কার দুয়ারে দিল হানা
সুদূরে যার বাজ্‌ল মাদল?—কোথায় রে তার কোন্ ঠিকানা?
ছুট্‌ল পাগল সব নিয়ে আজ আকাশপাতাল সব ভাসিয়ে
জটায় জটায় ছুল্‌ল আঁধার হাসিতে তার দিক কাঁপিয়ে
কোথায় ছিল গোপন মনে এত কথার আঁখির বারি?
বুকের কোলে খুল্‌ল যে আজ গভীর নিশার খুল্‌ল ঝারি!
বিবশ করে' নিশীথসুরের আলাপনে ভুবনখানি
বাজিয়ে দিল মনতারাতে উদাসরাতের অসীম বাণী

বাজিয়ে দিল ঝিল্লীরবের আঁধারফাটা তীব্র সুরে
প্রাণসাগরের কোন্ গোপনে ভুবন যে আজ চল্‌ল পুড়ে,
চল্‌ল অপার আজ্ অবারণ প্রাণের পূজা পুষ্প ফলে
লক্ষ হাজার ঝর্‌ল কমল উছল অতল স্রোতের জলে!
ঝর্‌ছে তাহার পাপ্‌ড়িগুলির পাখার কাঁপন প্রাণের পাতে
অজানা সুর বাজ্‌ছে তালে জীবনবনের মন্দিরাতে!
জ্বল্‌ছে যেথায় মাটির প্রদীপ কুঁড়ের কোণে মিটমিটিয়ে
নদীর ভাঙন ঘরের পিছে, দেখ্‌ছে উঠে গিয়ে গিয়ে,—
পড়্‌শীঘরের আস্‌ছে সারা চল্‌ছে সাড়া ডাকে ডাকে
কার চরণের শব্দটুকু পড়্‌ছে নিশির থাকে থাকে?
দেয় নি ওরা আঁধারে আজ দেয় নি ওরা সুর নিভিয়ে
ঘাট যে ওরাই বিশ্ববীণার—গড়াগানের রক্ত দিয়ে,—
গড়া কোথায় স্বপ্নে ঢালা কোন্ সে বিশাল ইন্দ্রপুরী
ভুবনবাণীর জমাট ব্যথার কোথায় রে মঠ আঁধার জুড়ি?
চম্‌কে উঠে কেকার ডাকে পেখমতলে লুটিয়ে পড়া
পিয়ে সুরা সুরসাগরের শঙ্খ কিরে ঘুমায় ওরা?
জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে ওরা? জাগ্‌বে কিরে?
দশদিকে যে বাজ্‌ল মাদল নাম্‌ল বাদল সুরে ঘিরে!
তারায় তারায় বাজ্‌ল যে শাঁখ ছায়াপথের সাগরজলে
অস্তগিরির কোন্ সে চূড়ার কোন্ সে গুহার বাসার তলে?
কাঁপছে যেথায় জলের গায়ে সন্ধ্যারতির রেশ-অবশেষ—
চল্‌ছে রেজে তারেই ঘিরে—কোড়ার ডাকের নাই যে রে শেষ,

বাজল তৃণের শিরায় শিরায় কাঁপিয়ে জলের অধীর ধারা
বাজ্‌ছে যেন যুগ হতে যুগ—একি রে কোন্ ধ্রুবতারা !
বাজ্‌ছে রেণুর পুলকপুরে নীরব চির বধূর ভালে
বাজ্‌ছে ঘরের জাগা বুকে বাজ্‌ছে ঘুমের অন্তরালে,
ধর্‌ছে না তার সুরের ধারা—ছাপিয়ে যে তার উঠ্‌ছে কানা—
বাজ্‌ছে সুরে এপার ওপার দিগন্তের আজ সব মোহানা !
ফাঁক দিয়ে তার দীপের আলো পড়ল না আর ভুবন মাঝে
অথির আকাশ নদীর কানে শুধুই কেবল গানটি বাজে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কথিকা।

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কি যেন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে যেদিকেই যায় ঠেকে যায়। এদিকে বাড়ি, ওদিকে বাড়ি, সাম্‌নে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একটুখানি আকাশের রেখা দেখ্‌তে পায়—ঠিক তার নিজেরই মত সরু, তার নিজেরই মত বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বল ত, তুমি কোন্ নীল সহরের গলি ?"

দুপরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্য্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না !"

বর্ষামেঘের ছায়া দুই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েচে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে' চম্‌কিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুক্‌নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত ?"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়া গলির মধ্যে হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়; ধূলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়্‌তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগ্‌লা দেবতার মাৎলামি!"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই সব হচ্চে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন?"

অথচ শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবৎ ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এদিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিনীর আঁচলটার মত বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে' যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর যাকে মনে ভাব্‌চি মস্ত একটা কিছু, সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।